পাঁচ দশকের বাংলাদেশে শতবর্ষের মুজিব

কাইউম পারভেজ

বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু দুটি পরস্পর সম্পূরক শব্দ। একটি অপরটির পরিপূরক। একটিকে ছাড়া আরেকটিকে উপলব্ধি করা যাবে না। অনুভব করা যাবে না। বিষয় দুটিকে আলাদাভাবে চিন্তা করা যেমন অর্থহীন তেমনি অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই পাঁচ দশকের বাংলাদেশকে জানতে হলে শতবর্ষী বঙ্গবন্ধু মুজিবকেও জানতে হবে।

একটু প্রাক কথনে আসা যাক। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত আর পাকিস্তান হলো - পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান হয়ে পকিস্তানের অংশ হয়ে রইলো কেবলমাত্র ধর্মের অজুহাতে। এছাড়া কোনভাবেই সেই পাকিস্তানের সাথে কোন মিল ছিল না। শিক্ষা চাকরী ব্যবসা আর পাবার হিস্যা সবটাতেই অগ্রগণ্য পশ্চিম পাকিস্তান। শোষণের এক মূর্তপ্রতীক। দিন যায় ওদের স্পর্ধা বাড়তে থাকে। হাত দিয়ে বসে বাংলা ভাষা সংস্কৃতিতে। বলে বাংলা হিন্দুর ভাষা এবং বাঙালি জাতির সংস্কৃতি হিন্দুর সংস্কৃতি। অতএব উর্দুই হবে রাষ্ট্র ভাষা। ওরা ভেবেছিলো ধর্মের দোহাই দিয়েই এই দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে বশ করা যাবে। ধর্মের প্রতি দূর্বল সেই মানুষগুলো কিছুতেই ধর্মের সাথে ভাষা সংস্কৃতির মুখোমুখি হতে চায়নি। বলে ওঠে ধর্ম যার যার ভাষা সংস্কৃতি সবার। বাংলা আমার মায়ের ভাষা আমার মুখের ভাষা এটা কোনভাবেই কেড়ে নেয়া যাবে না। এটা আমার জন্মগত অধিকার। বাঙালি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বাধিকার আন্দোলনে নেমে পড়লো। ভাষার জন্য প্রাণ দিলো – স্বাধিকারের জন্য প্রাণ দিলো। রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হয়ে গেল অলিখিতভাবে। নজরুলকে বদলে দেয়া হলো। সজীব করিবো 'মহাশ্মশান' হয়ে গেল সজীব করিবো 'গোরস্থান'। কৃষ্টি সংস্কৃতি হয়ে গেল তাহজীব – তমুদ্দন। ওরা বনে গেল প্রভু - ওরা আমাদের শাসক। চব্বিশ বছর এভাবে চললো। ওরা শাসক আমরা শাসিত। এক পর্যায়ে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তখন এক বিস্ময়কর নেতার আবির্ভাব হলো যিনি বললেন আর নয় এবার পূর্বপাকিস্তান তার স্বায়ত্বশাসন চায়। স্বাধিকার থেকে স্বায়ত্বশাসন। নিজ দেশের ভিনদেশী শাসকদের টনক নড়ে গেল। বিস্ময়কর নেতার জনপ্রিয়তা এবং কারিসমা দেখে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে। পাশাপাশি শোষণ নির্যাতনের মাত্রা আরো বহুগুণে বাড়িয়ে চলেছে। সারা পূর্বপাকিস্তানের মানুষ তাঁকে বাংলার বন্ধু অনুধাবন করে এক সময়ে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু" খেতাবে ভূষিত করে ফেলেছে। ওরা এই বিস্ময়কর নেতার গোপন নথি হাতড়ে জেনেছে ১৯২০ সালের ১৭মার্চ টুঙ্গী পাড়ায় যে খোকা জন্মেছিলো তার নামই শেখ মুজিবুর রহমান সেই-ই এ বিস্ময়কর নেতা সেই-ই এই বঙ্গবন্ধু। সর্বনাশ – ওকে বন্দী করো। ধ্বংস করে দাও।

ভাষার আন্দেলন থেকে স্বাধিকার স্বায়ত্বশাসনের দাবীর আন্দোলন সেখান থেকে ঐতিহাসিক ছয় দফা – এগারো দফার আন্দোলন, উনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান করে স্বৈরাচার উৎখাত করলেন। পাশাপাশি জেল জুলুম সইতে লাগলেন একটানা। পঞ্চান্ন বছর জীবনে দেশটার জন্য আন্দোলনই করেছেন ৩২ বছর। বাইশবার জেল খেটেছেন দেশটার মুক্তির জন্য দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য।

পারেনি কিছু করতে পাক শাসকরা বরং সকল জেল জুলুম উপেক্ষা করে তাঁর দাবীর কাছে মাথা নত করে নির্বাচন দিতে বাধ্য হলো। ১৯৭০-এর সে নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলো শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ। শাসকরা আবার ভিমরী খেলো। এবার বুঝি ক্ষমতাই বেহাত হয়ে যায়। না না না কোনভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। মুজিব তখনো বলছেন আমরা আমাদের স্বায়ত্বশাসন চাই। নানা রকম ফন্দি ফিকির বৈঠক আলোচনা চললো তবু তারা কোনভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো না। বরং সারা দেশে জুলুম নির্যাতন গণহত্যা বাড়িয়ে দিলো। প্রতিবাদে সাড়ে সাত কোটি প্রাণ ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে। না ওদের সাথে আর নয় আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝলেন এই উত্তাল জনস্রোতকে আর ঠেকিয়ে রাখো যাবে না। পাকিস্তানীরা যখন আর কোন আলোচনা সমঝোতায় আসছে না অতএব সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেবার। পহেলা মার্চ থেকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দেলনের ডাক দিলেন। মূলতঃ সেদিন থেকেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশ অচল হয়ে গেল। সাত মার্চ রেসকোর্সের মাঠে (পরবর্তীতে সোহরোয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকন্ঠে ঘোষনা করলেন – তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। .... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ... জয় বাংলা।

সেই সাত মার্চ থেকে গোটা দেশ থমথমে হয়ে পড়লো। সবার মনে প্রশ্ন কি হয় কি হয়। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রামে গঞ্জে সামরিক -বেসামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেছে। শহর ছেড়ে মানুষ গ্রামের মুখী হয়েছে। অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্প কারখানা সব কর্মহীন। এরই মাঝেই ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনী যুদ্ধের সকল প্রস্তুতিসহ গোলা-বারুদ রসদ নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর। চারিদিকে মৃত মানুষের লাশ আগুনের লেলিহান আর বারুদের গন্ধ। অসহায় মানুষের আর্তনাদ আর কান্না। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু এক ওয়ার্লেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষনা করে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহবান জানালেন। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সে ঘোষনা বিভিন্নজনের কন্ঠে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে। সেই মুহুর্ত থেকেই আমাদের স্বাধীনতার দিনপঞ্জী শুরু। বাংলাদেশের জন্ম তখনই। সেই তখন থেকেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। দখলদার বাহিনীর কবল থেকে আমাদের স্বাধীন দেশটাকে মুক্ত করার যুদ্ধ। যেখানেই দখলদার বাহিনী সেখানেই প্রতিরোধ প্রতিহত করার যুদ্ধ। দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ।

অবরুদ্ধ স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই বঙ্গবন্ধু মুজিব পাক জান্তার হাতে বন্দী হলেন। তাঁকে পরবর্তীতে নিয়ে যাওয়া হলো পাকিস্তানে। এদিকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম – তাজউদ্দীন আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত হলো প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বেই পরিচালিত হলো মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ। বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারতের সহযোগিতায় দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ হলো পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যদের সাথে। এর মধ্যে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। ৩০ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে আর দুই লক্ষের অধিক মা-বোন তাঁদের সম্ভম হারিয়েছেন নয় মাস ধরে এই স্বাধীনতার জন্য। নয় মাস যাবত এ যুদ্ধের শেষে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। যুদ্ধবিদ্ধস্ত এ নিঃস্ব দেশটিকে যাবার প্রাক্কালে পাক সেনারা ধ্বংসস্তূপ করে রেখে গেল। সেই ধ্বংসস্তূপ থেকেই দেশটাকে দাঁড় করার মানসে নানান প্রতিকূলতার মাঝে সেই প্রবাসী অস্থায়ী সরকার দেশে ফিরে হাল ধরলেন। তিন প্রধান চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ সরকার মাঠে নামলেন – ১. দেশে ল এ্যান্ড অর্ডার ঠিক রাখা ২. সারাবিশ্বের দেশ সমূহের কাছ থেকে নতুন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করা এবং ৩. পাকিস্তান থেকে বন্দী রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবিত উদ্ধার করে এবং শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা।

১০ জানুয়ারী ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরলেন। এখন তাঁর বিজয় মুকুটে আরেকটি পালক যুক্ত হলো। তিনি হলেন জাতির পিতা। তিনি এসেছেন ঠিকই কিন্তু কিছুই তো জানেন না কি করে এ দেশটা শত্রুমুক্ত হলো। এতে কার কি অবদান কার কি অপঃছায়া ভুমিকা। তিনি খোলা মনে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পোড়া মাটি আর ছাই নিয়েই শুরু করলেন। দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার বাংলাদেশটাকে সোনার বাংলা করতে। পিতা যেমন তাঁর সব সন্তানদের সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেন না তেমনি জাতির পিতা একই সময়ে সকল সন্তানকে এইভাবে তুষ্ট করতে পারছিলেন না। ফলে অসন্তুষ্টদের দল ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকলো। ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে তাঁর যেমন বন্ধু হতে লাগলো তেমনি বাড়তে থাকলো শত্রুর সংখ্যা। প্রকাশ্যে তারা কিছু বলতে না পারলেও ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকলো। প্রবাসী মুখোশধারী বন্ধুদেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আড়ালে তাঁর প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। তখনো বিশ্বজুড়ে কম্যুনিষ্ট জুজুর ভয়। ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের ঠান্ডা লড়াই। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পাশে ছিলো বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিপক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে নানাভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য সহযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কপালে দুশ্চিন্তার রেখাপাত করেছিলো। বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্টের চার মূলনীতি – গনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের সাথে সমাজতন্ত্রকে যোগ করে ফেলেছেন। মার্কিনীদের তখন ভয় বাংলাদেশ কি ক্রমশঃই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিনত হচ্ছে? মুজিব কি কম্যুনিজমের পথে হাঁটছেন? মুজিব কি দক্ষিন এশিয়ায় কম্যুনিজমের নেতৃত্ব দেবেন?

সত্যি মিথ্যা যাই হোক সন্দেহ যখন ঢুকেছে তখন সরিয়ে ফেলাই ভাল। সেই মোতাবেক ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ই বোষ্টার ঢাকার সিআইএ ব্যুরো চীফ ফিলিপ চেরীকে সাথে নিয়ে তৎপর হলেন। তাঁদের জন্য তো হেনরী কিসিঞ্জারের আশীর্বাদ ছিলোই। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যোগাযোগ শুরু করলেন তাদের সাথে যারা এতোদিনে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে চলে গেছে। খন্দকার মোস্তাকসহ কিছু সামরিক বেসামরিক মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে

১৯৭৫এর পনেরো আগষ্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিজ বাসভূমে স্বপরিবারে হত্যা করা হলো। এ সময়ে তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

আনুসঙ্গিক যে পটভূমিগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে সেগুলো হলো:

বাংলাদেশের যুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত অবস্থা
রক্ষীবাহিনী বিতর্ক ও সেনাবাহিনীর অসন্তোষ
পাকিস্তান ফেরত বনাম মুক্তিযোদ্ধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিরোধ বিভেদ
সেনাবাহিনীতে জিয়া-শফিউল্লাহ বিভেদ
স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক দুর্নীতির অভিযোগ
বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর উত্থান
সংবাদপত্রের ভূমিকা
ডালিম-মোস্তফা বিবাদ
জাসদ এবং সিরাজ শিকদারের উত্থান
দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও বাকশাল
ধর্ষণ-হত্যা মামলার বিরুদ্ধে দলীয় প্রাধান্য
দলীয় ষড়যন্ত্র: মোশতাক চক্র এবং সে চক্রের সাথে সামরিক সদস্যদের যোগসাযোশ

এই সব সেক্টরের সংশ্লিষ্টদের সাথে একাত্ব হয়ে বোষ্টারের ইন্ধনে ফারুক-রশীদ গংয়ের নেতৃত্বে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে ১৯৭৫-র ১৫ আগষ্টের কালো রাতে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়।
চার বছর বয়সী বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্রের জন্য সে কি এক দুঃসময়। সারা বিশ্বে এই নির্মম হত্যাকান্ডের নিন্দার ঝড় উঠলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনো অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে তলাহীন ঝুড়ির এ ব্যর্থ রাষ্ট্রটির আর মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ হবে না। দেশটার স্বাধীনতাই এখন বিপন্ন। জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সামরিকতন্ত্রের অধ্যায় শুরু হলো। একের পর এক সামরিক ক্যু তখন নিত্য দিনের সাথী। এর মাঝে ক্ষমতায় আসীন হলো খন্দকার মোস্তাক, উর্দী পরে আবার উর্দী ছেড়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুস সাত্তার, স্বৈরশাসক লে. জে.হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এমনিভাবে টানা ১৫ বছর। অবশেষে ১৯৯০ সালে সম্মিলিত এবং সমন্বিত যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার এবং সামরিক ছায়ার সরকারের পতন ঘটিয়ে এদেশে গনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। এতো কিছুর মধ্যেও দু'দশকের এই বাংলাদেশ ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেকটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট সেতু পুনঃর্নিমাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও অর্থনীতিতে তেমন গতির সঞ্চার হয়নি। সবচে বড় কথা হলো সামরিক শাসন বা সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় শাসিত কোন দেশের সাথে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশ গুলোর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে ওঠে না যার ফলে সে সকল দেশের সাথে কোন ব্যবসা বানিজ্যসহ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। দু'দশকের বাংলাদেশের ভাগ্যেও তাই ঘটেছিলো। যাহোক গনতান্ত্রিক ধারায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও এর বাকীটা পথ কখনো মসৃণ হয়নি। নানা প্রতিকূলতা রাজনৈতিক সংঘাত বিপর্যয় আর চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে আজ থিতু হয়েছে বাংলাদেশ। এ এক নতুন বাংলাদেশ। কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে হয় সাবাস বাংলাদেশ – এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়। গত এক দশকে এর ক্রমবর্ধমান অগ্রসর একে রোল মডেলের আসনে আসীন করেছে। তলাহীন ঝুড়ির স্বল্পউন্নয়নের দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে বাংলাদেশ । কেমন করে হলো?
তিনটি শর্ত পূরণ করলে জাতিসংঘ এ সত্য মেনে নেয়। শর্ত গুলো হলোঃ

১. মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ ইউএস ডলার সেখানে ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৮২৭ ইউএস ডলার

২.মানবসম্পদ সূচকে প্রয়োজন হয় ৬৬ পয়েন্ট সেখানে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৭৫.৩

৩. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে থাকতে হয় ৩২ পয়েন্ট বা তারচে কম সেখানে বাংলাদেশের পয়েন্ট ২৫.২

আরো বিস্ময়কর হলো সেই তলাবিহীন ঝুড়িতে এখন বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ৪৪.০৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। নিচের ছক দুটোতে বিস্তারিত বোঝা যাবে:

সূচক	২০০৮-২০০৯ সাল	২০১৯-২০২০ সাল
জিডিপি	১০৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৩০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
রফতানী আয়	১৫.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪০.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
		বর্তমান
বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ	৭.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	৪৪.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

কৃষি, শিল্প, গ্রামীণ উন্নয়নে সর্বত্রই সে এক বিশাল কর্মকান্ড। গার্মেন্টস (বিশ্বে ২য়), ওষুধ, ডিজিটাল টেকনোলজী এবং কৃষিতে অর্থনৈতিক বিপ্লব। মংগার দেশে এখন ফসল উদ্‌বৃত্ত। ধান উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ, সবজী উৎপাদনে ৩য় এবং মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলদেশের স্থান ২য়। এ সব উন্নয়নে মানুষের স্বতঃফুর্ত অংশগ্রহণে তাদের সামজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে । দারিদ্র হচ্ছে বিলীন

সূচক	২০০১	২০১৯
দারিদ্রের হার	৪৮.৯%	২০.৫%
হত-দারিদ্রের হার	৩৪.৩%	১০.৫%

স্বাস্থ্যখাতে গত এক দশকে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটেছে। করোনা মোকবেলায় বিশ্বের এক অনন্য উদহারণ এখন বাংলাদেশ। করোনা মহামারীতে যখন গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব পড়েছে সেখানে বাংলাদেশে মন্দার কোন ছোঁয়াই লাগেনি বরং ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা প্রতিরোধক টিকা যখন বাংলাদেশে ৩ লাখের বেশী প্রদান করা হয়ে গেছে সে মুহুর্তে বিশ্বের ১৩০টি দেশ সে টিকার কোন ব্যবস্থাই করতে পারেনি। চিকিৎসার সেবা এখন ওয়ান স্টপ সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে মানুষের দ্বার প্রান্তে। মানুষের গড় আয়ু ২০০৯ -১০ সালে ছিল ৬৯.৬১ বছর শেষ দশকে (২০১৯ – ২০) এখন সেটা ৭২.৬ বছর।

প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কি.মি পদ্মা সেতু নির্মাণ করে সারা বিশ্বে চমক লাগিয়ে দিয়েছে একদার তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশ। মেট্রোরেল, পাতাল রেলের বাস্তবতা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এক্সপ্রেস এলি্ভেটেড হাইওয়ে ব্যবসা বানিজ্যে এবং দূর পাল্লার যাত্রায় এনেছে অভূতপূর্ব আগ্রগতি। অন্তরীক্ষে বঙ্গবন্ধু -১ স্যাটেলাইট উক্ষেপন করে বাংলাদেশ তার স্বক্ষমতার নজির স্থাপন করেছে।

এই ছিলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা যার বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আর দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা দিয়ে। পাঁচ দশকের বাংলাদেশে গত এক দশকে তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশের রূপ বদলে গেছে। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের দরবারে তলাহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজ তৃতীয় বিশ্বকে নেতৃত্বের আসনে পোঁছে দিয়েছে। তিনি ছিলেন বলেই - তিনি আছেন বলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শতবর্ষেও বাংলার মানুষের হৃদয় সিংহাসনে রয়েছেন সমাসীন। তাঁর মাঝেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি বাংলার মানুষ দেখতে পায় – তাঁর হাতেই দেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার মশাল। কেবলমাত্র দূর্নীতিটার লাগামটা আরেকটু শক্ত হাতে টেনে ধরতে পারলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশের স্বীকৃতি পেতে একে রোখে কে? দূর্ভাগ্য পাঁচ দশকেও দূর্নীতির নির্মম ছোবল থেকে নিস্তার পাওয়া গেল না। তবে এর থেকে মুক্ত হবেই বাংলাদেশ। এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। জয় হোক বঙ্গবন্ধুর - জয় হোক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। বাংলাদেশ চিরজীবি হোক। জয় বাংলা।

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ:

এ লিগেসী অব ব্লাড - এ্যান্থনী মাসকারেনহাস
চল্লিশ থেকে একাত্তর - এম আর আখতার মুকুল

মুজিবের রক্ত লাল - এম আর আখতার মুকুল
মূলধারা একাত্তর – মাঈদুল ইসলাম

(প্রবন্ধটি ২০মার্চ ২০২১ ইঙ্গেলবার্ন লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে লেখক কত্তৃক উপস্থাপিত হয়। সুধীজনরা পরবর্তীতে প্রবন্ধটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন)